যে প্রিয়বাবুকে আমি চিনতাম

জহর সরকার

সুমন ভট্টাচার্য ও অমিতাভ সিংহ সম্পাদিত "প্রিয়-ভাষ" গ্রন্থে প্রকাশিত
প্রকাশক : গণ সংস্কৃতি সংসদ, ১৩ নভেম্বর ২০২৬

১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাস। তখন আমি বর্ধমানের জেলাশাসক। হঠাৎই একদিন নবনিযুক্ত কেন্দ্রীয় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর থেকে আমার কাছে ফোন এল । মন্ত্রী আমায় সরাসরি তাঁর দপ্তরে প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। এই ফোন পেয়ে আমি সত্য়িই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম । দাশমুন্সি সাহেবকে আমি বিশেষ চিনতাম না। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে তাঁকে কাজ করতে দেখেছিলাম এবং এটুকুই জানতাম, তখনকার বামফ্রন্ট সরকার তাঁকে যথেষ্ট সামলে চলত ।

আসলে সেই সময় আমি নিজেই দিল্লিতে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম । কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কোনও পদে কাজ করার জন্য আবেদনও করেছিলাম, কিন্তু রাজ্য সরকার আমাকে ছাড়তে রাজি হচ্ছিল না।

এরকম সময়ে মন্ত্রীর এমন একটা প্রস্তাব পেয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম । শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকার আমাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে যোগ দেওয়ার অনুমতি দিল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নিজে হস্তক্ষেপ করে বলেছিলেন, দিল্লিতে বাংলারও অফিসার থাকা দরকার।

১৯৮৬ সালের ১ ডিসেম্বর । রাজধানীতে প্রচণ্ড ঠান্ডা । এমনই এক কনকনে শীতের সকালে আমি দিল্লিতে মন্ত্রীর দপ্তরে যোগ দিলাম । প্রথম দিন থেকেই বুঝতে পারলাম, মন্ত্রী মশাই অত্যন্ত পরিশ্রমী মানুষ। তখনও তিনি বিয়ে করেননি । কাজেই স্ত্রী না থাকায় সাংসারিক জীবনের কোনও বাঁধন কিংবা সময়ের ধারণা, কোনওটাই ছিল না ।

সেই যুগে দিল্লিতে আধিকারিকদের সরকারি আবাসন পেতে অনেক সময় লাগতো। কিন্তু মন্ত্রীর অফিসাররা ফ্ল্যাট খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যেতেন । তা সত্ত্বেও সবকিছু গুছিয়ে থাকার সুবন্দোবস্ত করতে সাধারণত তিন-চার মাস তো লেগেই যেত । তাই আমি তখন একাই বঙ্গভবনে থাকতে শুরু করলাম ।

ফলে উদ্যোগ ভবনের মন্ত্রীর দপ্তরে বা জনপথে তাঁর সরকারি বাংলোয় গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতে আমার অসুবিধা হত না। কাজের বিশাল পরিমাণ নিয়েও কোনও সমস্য়া ছিল না। আসল জটটা ছিল, সারাদিনের কাজকর্ম কীভাবে এগোবে, তা কেউই জানতেন না— এমনকী মন্ত্রী নিজেও নয় !

কখনও এক পাহাড়প্রমাণ ফাইল নিয়ে আমাকে তাঁর বাংলোর দপ্তরে সন্ধ্যা ছ'টায় হাজির হতে বলতেন, অথচ তিনি নিজে সেখানে পৌঁছতেন রাত দশটায় বা তারও পরে। ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম, তাঁর মতো মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতাদের হাতে এত বেশি কাজ থাকে এবং এর সঙ্গে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হয় যে, তাঁদের দৈনন্দিন সময়সূচি কার্যত অমানবিক হয়ে ওঠে।

ব্যক্তিগতভাবে প্রিয়বাবু আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন আর যথেষ্ট মনোবল দিতেন —যদিও দপ্তরের কোনও কর্মী বা তাঁর দলের কোনও সদস্যকে কখনও কখনও কড়া কথা শুনিয়ে দিতে দ্বিধা করতেন না । আগেই বলেছি, তিনি দিনে প্রায় ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতেন এবং অন্যদের কাছেও ঠিক একই রকম পরিশ্রম আশা করতেন। তাঁর সঙ্গে কাজ করতে করতে খুব শিগগিরই বুঝতে পারলাম, তিনি একশো শতাংশ রাজনৈতিক মানুষ এবং রাজনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে জড়িত । পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও ছোটখাটো খবর তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করত । তিনি আমাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, ফাইলগুলি পড়ে প্রতিটি বিষয় ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং তার সঙ্গে জড়িত সমস্ত জটিলতা তাঁকে প্রতি ফাইলে মাত্র দুই থেকে চার মিনিটের মধ্যে জলের মতো সহজ করে বুঝিয়ে বলতে হবে।

কাজটি ছিল বিরাট কঠিন। এদিকে দিল্লির প্রশাসনিক কাজকর্মের ধরনে আমি তখনও অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি। সেখানে সামান্য অসতর্ক হলেই বিপদে পড়ার প্রভূত আশঙ্কা ছিল। চারিদিকে শুধু ধান্দাবাজ মানুষ আর মিথ্যুকরা ঘুর ঘুর করত। তার উপর বাণিজ্য মন্ত্রক ছিল অত্যন্ত টেকনিকাল ও বিশেষজ্ঞ-নির্ভর একটি দপ্তর, যেখানে প্রতিটি পরিভাষার অর্থ সাধারণ মানুষের ধারণার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা।

ফলে বেশিরভাগ সময়ই আমাকে জটিল নোটে ঠাসা বিশাল বিশাল ফাইলের স্তূপের মধ্যে ডুবে থাকতে হত। তুলনামূলকভাবে জুনিয়র অফিসার হওয়ায়, সমস্যাগুলি ঠিক কোথায়, তা বোঝার জন্য মন্ত্রকের প্রবীণ আধিকারিকদের কাছে ছুটতে হত। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার ছিল— মন্ত্রী তাঁর নিজের টিমকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন এবং আমাদেরও কর্তব্য ছিল তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখা। আমি যতদিন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলাম, ততদিন মন্ত্রকে কোনও কেলেঙ্কারি বা দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি। নিঃসন্দেহে এটাও ছিল এক বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়।

কিন্তু আমার এই দৃঢ় ও কঠোর অবস্থান অনেক সময় স্বার্থান্বেষী কয়েকজনকে অসন্তুষ্ট করে তুলেছিল। বিষয়টি ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর। বহু রাজনৈতিক নেতা তাঁদের বন্ধুদের নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, যাঁদের কারও না কারও বাণিজ্য মন্ত্রকের সঙ্গে কাজের সম্পর্ক ছিল। প্রিয়বাবু তাঁদের সঙ্গে অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করতেন, কিন্তু আমাকে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, নিয়ম মেনেই কাজ করতে হবে এবং তাঁর ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। কাজটা সহজ ছিল না। কারণ, আমাদের দু'জনের উপরই প্রবল চাপ থাকত। অনেকের নিজেদের কিংবা তাঁদের বন্ধুদের জন্যে করা অনুরোধ নিয়মবিরুদ্ধ ছিল।

আবার কখনও উল্টোটাও ঘটত। মন্ত্রকের কিছু আধিকারিক হয়তো অকারণে নেতিবাচক মনোভাব দেখাতেন, অথবা এমন মানুষদের হয়রান করতেন, যাঁদের প্রস্তাবে আদৌ কোনও ত্রুটি ছিল না। স্পষ্টতই, ব্যবসায়ী মহল কিংবা সরকারি আধিকারিক— উভয় ক্ষেত্রেই দুর্নীতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলাম, মন্ত্রী এবং আমার কাজের অবস্থান কতটা সূক্ষ্ম ও ঝুঁকিপূর্ণ।

কিছুদিনের মধ্যেই কিছু অসন্তুষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও অন্যান্য ব্যক্তিরা মন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করলেন, আমি নাকি অতিরিক্ত কড়াকড়ি করছি, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের ফাইল আটকে রাখছি। এ ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক অভিযোগ। মনে আছে, যখনই এই ধরনের কিছু ঘটত, আমি ভীষণ বিচলিত ও হতাশ হয়ে পড়তাম। কিন্তু মন্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি আমাকে আশ্বাস দিতেন, সরকারের অনুমোদিত নিয়মকানুন কী বলছে, আর আমার নিজের বিচারবুদ্ধি ও বিবেক কী নির্দেশ দিচ্ছে, সেটাই যেন আমি তাঁকে জানাই।

একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে প্রথম দফার কার্যকালে এটি ছিল প্রিয়বাবুর এক অসাধারণ গুণ। আমি সর্বক্ষণ মানসিক চাপে থাকতাম, আর রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য তাঁর উপরও নিরন্তর চাপ থাকত। কিন্তু কোনও দুর্নীতির অভিযোগকে তিনি তাঁর কাজকর্মের উপর প্রভাব ফেলতে দেননি। কেউ কেউ তাঁর উপর রাগ করতেন, কিন্তু তিনি সেসব সহজভাবেই সামলে নিতেন। তিনি আমাকে শুধু বলতেন, কে কী বলল তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, যা সঠিক বলে মনে করছি, আমাদের দুজনকে সেটাই করে যেতে হবে। দিল্লিতে আমার কর্মজীবনের একেবারে গোড়ার দিকে তিনি আমাকে যে সুরক্ষা দিয়েছিলেন, তার জন্য আমি তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

প্রিয়বাবু ছিলেন এক লড়াকু রাজনৈতিক নেতা, যিনি রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে গিয়েছিলেন। আর আমি ছিলাম এই দুই পক্ষের মাঝখানে কার্যত স্যান্ডউইচ হয়ে যাওয়া এক সরকারি আধিকারিক।

একটি ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছিল, নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র হাওড়ার মানুষের সঙ্গে মন্ত্রীর সম্পর্ক কতটা গভীর, বিশেষত যখন রাজ্য সরকার তাঁর বিরোধিতা করছিল।

মনে আছে, একদিন বাণিজ্য মন্ত্রকের সচিব—অত্যন্ত প্রবীণ এক আমলা—আমাকে ডেকে জানালেন যে জেনেভায় একটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বৈঠক রয়েছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে তিনি প্রতিমন্ত্রীকে সেই বৈঠকে ভারতের নেতৃত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রিয়বাবু নিজেও জেনেছিলেন, বৈঠকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তেছে । আলোচ্য বিষয়গুলি ছিল বেশ জটিল। আমার কাজ ছিল, প্রথমে নিজে সবকিছু ভালোভাবে বুঝে নিয়ে মন্ত্রীকে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া । পরবর্তী কয়েক দিন আমি শিল্প ভবনে প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত কাজ করেছিলাম। কারণ, প্রায় সারাদিন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে লোকজনের আনাগোনা লেগেই থাকত । রাত আটটা নাগাদ সেই ভিড় কমে গেলে কিছুটা নিরিবিলিতে মন দিয়ে কাজ করার সুযোগ পেতাম।

প্রতিটি বিষয় বুঝতে এবং তিনটি দীর্ঘ ব্রিফিং বৈঠকে মন্ত্রীকে সবকিছু ব্যাখ্যা করে বিশদে বোঝাতে প্রচুর সময় লেগে গিয়েছিল। প্রিয়বাবুর অবশ্য বিষয়গুলি দ্রুত অনুধাবন করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। এই অভিজ্ঞতা তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

আমরা সুইৎজারল্যান্ডে প্রথম সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বলে বেশ উদ্বিগ্নই ছিলাম। এদিকে রওনা হওয়ার দিনই হাওড়ার পিলখানা অঞ্চলে আগুন লাগার একটা দুর্ঘটনা ঘটল। মন্ত্রী তখন একের পর এক টেলিফোনে ব্যস্ত। আমরা বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে বাড়ি ফিরে পোশাক বদলানোর জন্য দপ্তর ছেড়ে বেরতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময় প্রিয়বাবু আমাকে ডেকে তাঁর বিদেশ সফর বাতিল করতে বললেন। বিন্দুমাত্র ভাবনাচিন্তা না করে পরবর্তী বিমানেই কলকাতা ও হাওড়ার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন মন্ত্রী । একজন রাজনীতিক হিসেবে তাঁর কাছে নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রের মানুষ ও তাঁদের বিপদ-আপদ সুইৎজারল্যান্ডের গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বৈঠকের চেয়েও অনেক বেশি জরুরি ছিল।

এমনটাই ছিলেন আটের দশকের কংগ্রেস জমানার জাতীয় স্তরের দাপুটে নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি ।